দেয়াললিপির ইতিকথা

হাসান মূর্তাজা

'কষ্টে আছি'- আইজউদ্দিনের লেখা এই দেয়াললিপি চোখে পড়েনি এমন মানুষের সংখ্যা ঢাকা শহরে হাতেগোনা। রাজনৈতিক স্লোগানে ছেয়ে যাওয়া ঢাকার দেয়ালে এই একটি ব্যতিক্রমী দেয়াললিখন। পথ চলতি মানুষের অনুভূতিকে ছুঁয়েছে; দু'দন্ড দাঁড়িয়ে ভেবেছি, সত্যি কষ্টে আছি।

ক'বছর আগে অক্সফোর্ড থেকে লন্ডন যাবার রাস্তার পাশে দেয়ালে এমনি আরেক দেয়াললিপির উদয় ঘটে। বেশ মোটা হরফে লেখা দীর্ঘ দেয়াললিপিটা যেকারো চোখে পড়তো। লেখা ছিল : 'কেন আমি প্রতিদিন এ কাজ করি'? (Why do I do this everyday?)। নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়। আবার যেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে লেখা। বিবিধ উদ্দেশ্যে পথ চলা মানুষের মনে দেয়াললিপিটা পড়ে হরেক কিসিমের ভাবের উদয় হতো। ইরাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী নানা স্লোগানের নিচে চাপা পড়ে যায় এই দেয়াললিপি। ইদানীং সবুজ আর কালো কালিতে আবার কেউ সেটা লিখে দিয়েছে। ঈষৎ পরিমার্জিত সংস্করণে : 'এখনো কেন আমি প্রতিদিন এ কাজ করি? (Why do I still do this everyday?)

দেয়াললিখনের অভ্যাসটা প্রত্যেককালে প্রত্যেক জাতিতে ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৭৯ অব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির লাভার নিচে চাপা

দুই কালের দুই দেয়াললিপি

পড়া পম্পেই শহরের দেয়াল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের নরওয়েজিয়ান চার্চ কিংবা অষ্টাদশ শতকে পারস্যের শৌচাগারের দেয়াল-দেয়াললিপি সর্বত্র বিরাজমান। মানুষের এ এক অদ্ভুত তাড়না। গুহাগাত্রে, দেয়ালে, মাটির পাত্রে, নিদেনপক্ষে ক্লাসের বেঞ্চিতে কিছু একটা লিখতেই হবে। এ লেখাজোঁকা করতে গিয়েই ভিক্টোরিয়া যুগের অভিযাত্রীরা কত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের বারোটা বাজিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের দিন থেকেই দেয়াল লিখনের ভূত মানুষের কাঁধে চেপে বসে আছে। এথেনীয় আগোরার আশপাশে খোঁড়াখুঁড়ি করে যেসব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে অনেকগুলোতে লিখিয়েদের কীর্তি দৃশ্যমান। এর অনেকগুলো এরিস্টোফেনিসের নাটক কিংবা হেরোডেটাসের ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। মুখের সচল বাণীকে অচল বর্ণে ধারণের প্রযুক্তি তখন সবে আবিষ্কার হয়েছে। তো কি লিখতেন সেই আদি লেখকেরা? অধিকাংশ লেখাই ছিল বাজারের লিস্টি বা কোনো জিনিসের মালিকানা সংক্রান্ত। যেমন- এই কাপটি থারিওসের। তবে দেয়াললিখনের মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় অসংখ্য মানুষকে জানিয়ে দেয়ার আধুনিক প্রবণতা অবশ্য সেই যুগেও ছিল। একটি পাত্রে লেখা বাণী এ রকম : অলিম্পিক বিজয়ী টাইটাস আসলে একজন লুচ্চা!

দেয়াললিপির কোনোটাই চিরস্থায়ী হয় না। প্রতিপক্ষ মুছে দেয়। রোদ-বৃষ্টি মুছে দেয়ার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে। ছবি কিংবা বইয়ের পাতায় ঠাঁই পেলে দেয়াললিপির আয়ু বাড়ে। ১৭৩১ সালে লন্ডনে এমনই এক অভাবনীয় কাজ করেছিলেন জনৈক সম্পাদক। হার্লো থ্রাম্বো ছদ্মনামের আড়ালে 'দ্য মেরি থট' নামের বইতে সংকলন করেছিলেন অসংখ্য দেয়াললিপি। অধিকাংশই সংগ্রহ করা হয়ছিল দেয়াল লেখকদের প্রিয় স্থান শৌচাগারের দেয়াল থেকে। অসংখ্য মজার এবং বুদ্ধিদীপ্ত দেয়াললিপির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে যার অনেকগুলো পরবর্তীতে রীতিমত প্রবচনে পরিণত হয়। কাব্যে লেখা একটি দেয়াললিপি ছিল এরকম :

তাড়া ছিল, তাই এসেছিলাম মলত্যাগে
দেয়াল ভরা জ্ঞান-মলে, তাই রেগে
দেখিয়ে দিতে কাব্য প্রতিভা, যাই ভুলে
পয়ঃকার্যের শেষকালে পানি নিতে।

শৌচাগারের দেয়ালে লেখা নিয়ে রীতিমতো গবেষণাও হয়েছে পশ্চিমে। আঠারো শতকের গোড়াতে ইউরোপে বিশেষত ব্রিটেনে নারী-পুরুষ একই গণশৌচাগার ব্যবহার করতো। সে সময় ছেলেরা দেয়ালে লিখত মেয়েদের উদ্দেশ্য করে। আর মেয়েরা করতো উল্টোটা। প্রেম নিবেদনের মোক্ষম জায়গা ছিল শৌচাগারের দেয়াল। সেসব প্রেম আকুতির অনেক নজির পাওয়া যাবে থ্রাম্বোর বইতে। পরবর্তীতে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের প্রচলন শুরু হলে দেয়াললিপির প্রাপক বদলে সমলিঙ্গের কেউ হয়ে পড়ে। কাজেই বদলে যায় দেয়াললিপির 'ভাষা'। গবেষকরা বলছেন, ছেলেদের দেয়াললিপির ভাষা মেয়েদের চেয়ে শব্দবহুল এবং বিদ্বেষপূর্ণ। তুলনায় মেয়েদের দেয়াললিপি সংক্ষিপ্ত এবং খানিকটা নীতিমূলকও বটে। শৌচাগারের দেয়াললিপিকে ইংরেজিতে বলা হয় ল্যাট্রিনালিয়া (Latrinalia)। গবেষকদের

সিডনি অপেরা হাউজের ছাদে যুদ্ধ বিরোধীদের স্লোগান

মতে, এই ভাষা যথেষ্ট ঐতিহ্যবাহী এবং যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তনীয়।

দেয়াললিপির সঙ্গে রাজনীতির বন্ধনটা শৌচাগারের দেয়ালের চেয়ে টের পাওয়া যায় রাস্তার পাশের খোলা দেয়ালে। যুদ্ধ, স্বৈরশাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন জন্ম দেয় নতুন নতুন প্রকাশভঙ্গির। দেয়াললিপি এর অন্যতম। প্রকাশ্য দেয়াল জুড়ে থাকা এসব লিপির উদ্দেশ্য জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ, জনসমর্থন জোটানো। এ জাতীয় রাজনৈতিক দেয়াললিপির সঙ্গে আমাদের জানাশোনাটা অন্যদের চেয়ে বেশি। শহীদ নূর হোসেনের বুকে-পিঠে লেখা : 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' তো এখন ইতিহাস। একে যদিও দেয়াললিপি বলা চলে না। ফিলিস্তিনে প্রথম ইন্তিফাদা চলাকালীন (১৯৮৭-৯৩) পশ্চিম তীরের একটি দেয়াললিপি এমনি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। দেয়ালে লেখা ছিল 'কারাগার হচ্ছে বিশ্রামাগার, নির্বাসন বিদেশ ভ্রমণ, আর পাথর ছোঁড়া তো শরীরচর্চা।' পশ্চিম তীরের দেয়ালে দেয়ালে ফিলিস্তিনী তরুণদের লেখা দেয়াললিপিগুলো সে সময় দখলদার ইসরায়েলিদের ভীত করে তুলেছিল। দেয়াল লেখক পেলেই তারা গ্রেপ্তার করতো। এক পর্যায়ে দেয়াললিখন ঠেকাতে দেয়ালের মালিকদের জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু দেয়াললিখন থামেনি। এক পর্যায়ে দেয়াললিপি হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের বিকল্প।

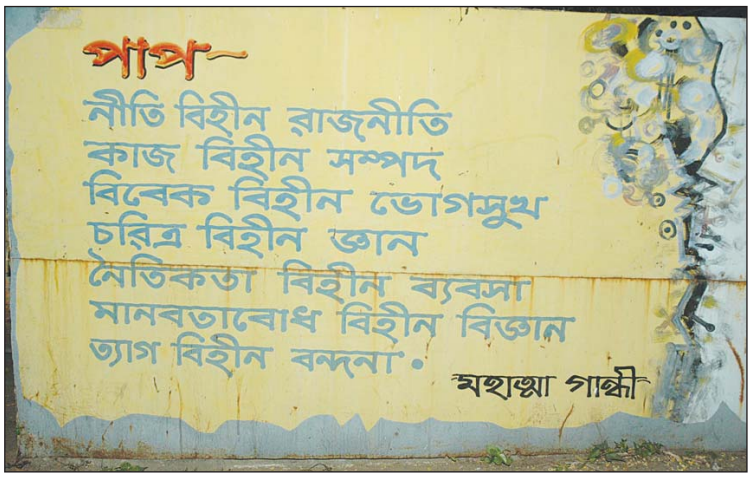

ঢাকার দেয়ালে লেখা নীতিকথামূলক দেয়াললিপি- ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**

দেয়াললিখনকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছে খ্রিষ্টান ইভানজেলিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকে বাড়ির দেয়াল আর সদর দরজায় খোদার নির্দেশনামা লিখে রাখার নির্দেশ আছে। ইভানজেলিক খ্রিষ্টানরা নিজের ঘরদোর তো বটেও প্রতিবেশীটাও তুলির আঁচড় থেকে রেহাই দেয়নি। মধ্যযুগে প্রটেস্টান্ট নেতা জঁ ক্যালভিনের অনুপ্রেরণায় উপাসনা গৃহের দেয়ালে রঙবেরঙের বাইবেল বাণী উৎকীর্ণ করার রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

আধুনিক যুগে এসে দেয়ালগাত্রে বাইবেলের বাণীকে ঠাট্টা করার প্রবণতা দেখা দেয়। সত্তর দশকে নারীবাদের জোয়ার চলাকালীন লন্ডনের দেয়ালে বাইবেলের বয়ানে পুরুষ প্রাধান্যকে কটাক্ষ করার চল শুরু হয় এভাবে- 'তিন বিজ্ঞ লোক- মজা করছেন না তো?' যেন পুরুষ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ হওয়াটা অসম্ভব কিছু। পুরুষ বিদ্বেষী কিছু দেয়াললিপিও এ সময় চোখে পড়ে- 'নিজের ঈশ্বর মনে করে এমন ব্যাটা ছেলের জন্মটা আজকাল কোনো বিরল ঘটনা না।' ক'বছর আগে ওয়েস্ট কেনসিংটনের একটি দেয়াললিপি এমন- 'God so loved the world that he gave his only Sony.'

৭০ দশকের গোড়াতে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শৌচাগার থেকে সংগৃহীত দেয়াললিপির গবেষণা অনেককে চমকে দিতে পারে। উদারনৈতিক হিসেবে বিবেচিত বার্নার্ড, কলাম্বিয়া এবং রুটজার্সের মতো বিদ্যানিকেতনের শৌচাগারের দেয়ালে পাওয়া যায় যত সব বর্ণ এবং লিঙ্গ বিদ্বেষী দেয়াললিপি। এসব লিখনের অন্তত ২০ শতাংশ সমকামী এবং ১৭ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গদের কটাক্ষ করে লেখা। পক্ষান্তরে রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শৌচাগারে উল্লেখ করার মতো কোনো বিদ্বেষবাণী পাওয়া যায়নি। গবেষকরা বলছেন, রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে বর্ণবাদী মন্তব্য করা সহজসাধ্য ছিল বিধায় কেউ কষ্ট করে দেয়ালে লেখার তাগিদ অনুভব করেনি। কিন্তু প্রগতিশীল পরিবেশে নিজের বর্ণ বিদ্বেষ উগলে দিতে শিক্ষার্থীদের একান্ত গোপনীয় স্থানের দেয়ালটিই ছিল ভরসা।

মধ্যযুগে দেয়াললিপিকাররা ছিলেন সমাজের উচ্চশ্রেণীর বাসিন্দা। কেননা পড়ালেখার কাজটি সে সময় কেবলই এই শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'দ্য মেরি থট' বইতে দেখা যায় ইংরেজির পাশাপাশি ল্যাটিন কিংবা ফরাসী ভাষাতেও দেয়াললিপির চল ছিল সে সময়। আজকে প্রায় প্রতিটি মানুষ দেয়ালে মনের কথা গেঁথে দিতে পারবে। অনেক মানুষ সেটা পড়তেও পারবে। কিন্তু দেয়াললিপির এমন রমরমা দিনে এসে এর প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু কেন?

কারণ প্রযুক্তি। ইন্টারনেট। ইন্টারনেট যে পরাবাস্তবতার জগৎ তৈরি করেছে, সেই জগতে দেয়াললিখনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া মনের কথার পাঠক অসংখ্য। কালি-কলমের ঝামেলা নেই। কাজেই কি দরকার দেয়াললিখনের।

দেয়াললিপির হাজার বছরের ঐতিহ্যের দিন কি তাহলে শেষ? গবেষকদের আশঙ্কা সত্যি হলে তা হবে আফসোসের কথা। দেয়াললিপিকে সমাজের বা যুগের দর্পণ ধরেন অনেকেই। যুদ্ধ বিরোধী দেয়াললিপির বাহুল্য দেখে ধরে নেয়া যায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণদের মাঝে শান্তিবাদী মনোভাব চাঙ্গা হচ্ছে। দেয়াললিপি মুছে গেলে সমাপ্তি ঘটবে সমাজপাঠের এ অধ্যায়ের।